# দেহ-লুঠেরা

### এইচ জি ওয়েলস

★2022★

# দেহ-লুঠেরা

( The Story of the Late Mr. Elvesham )

[‘The Story of the Late Mr. Elvesham’ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘The Idle’r পত্রিকায় মে ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালে লন্ডনের ‘Methuen & Co.’ থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের ছোটগল্পের সংকলন ‘The Plattner Story and Others’ বইটিতে গল্পটি স্থান পায়। জুন ১৯২৭ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ‘Amazing Stories’-তে।]

কাহিনিটা লিখে যাচ্ছি স্রেফ পরোপকারের মনোবৃত্তি নিয়ে। আমার মতো আর কেউ যেন ফাঁদে পা না দেয়। আমার দুর্গতির কাহিনি পড়ে যেন পাঁচজনে উপকৃত হয়। আমার যা হবার, তা তো হয়েই গেছে। পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুর জন্যে তৈরি হচ্ছি।

জানি, অবিশ্বাস্য এই কাহিনি পড়ে মুচকি হাসি হাসবেন প্রত্যেকেই। সত্যি কথা বলতে কী, বিশ্বাস করানোর প্রত্যাশা নিয়েও কলম ধরিনি। উদ্দেশ্যটা স্রেফ পরোপকার–আমার মতো হাল আর যেন কারও না হয়।

এবার শুনুন আমার নামধাম, বাবা-কাকার পরিচয়। এডওয়ার্ড জর্জ ইডেন, এই নামে আমি ধরায় আগমন করেছিলাম খুবই মন্দ কপাল নিয়ে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ট্রেন্টহ্যামে। বাবা চাকরি করত ওখানকার বাগানে। মা-কে হারিয়েছি তিন বছর বয়সে, বাবাকে পাঁচ বছরে। ছেলের মতো করেই মানুষ করেছিল কাকা জর্জ ইডেন। বিয়ে-থা করেনি কাকা। উচ্চশিক্ষিত। পেশায় সাংবাদিক। বার্মিংহ্যামে চিনত সবাই। শিক্ষার বীজ, উচ্চাশার নেশা ভালোভাবেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার ভেতরেও। মারা যাওয়ার সময়ে উইল করে

নিজের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে যায় আমার নামে। সবার পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দেখা গেল তার পরিমাণ পাঁচশো পাউন্ড। উইলে একটাই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিল কাকা। লেখাপড়া শেষ করার পর যেন টাকাটা খরচ করি। ডাক্তারি পড়ব বলে তখন মনস্থ করে ফেলেছি। স্কলারশিপের টাকায় আর কাকার সম্পত্তির জোরে ভরতি হয়ে গেলাম লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ডাক্তারি ক্লাসে। তখন থাকতাম ১১এ, ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের বাড়িতে ওপরতলার যাচ্ছেতাইভাবে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একটা ছোট্ট ঘরে। কানাকড়ির হিসেব রেখে অত্যন্ত মিতব্যয়ী থাকব, এই অভিলাষে ছোট্ট এই ঘরখানাতেই থাকা, খাওয়া, শোয়া, পড়া–একাধারে সবই চালিয়ে যেতাম।

একদিন বগলে পুরানো একজোড়া জুতো নিয়ে বেরতে যাচ্ছি টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে মুচির কাছ থেকে মেরামত করে আনব বলে, এমন সময়ে দেখলাম, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ চেয়ে আছে দরজার নম্বরের দিকে। নম্বর সঠিক কি না বুঝতে পারছে না। চৌকাঠ পেরিয়ে পড়লাম একেবারে বুড়োর সামনেই। মুখখানা হলদেটে। জীবনে কখনও দেখিনি। কিন্তু আমার সারাজীবন এখন জড়িয়ে গেছে এই বুড়োর জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম জটিলভাবে।

দরজা খুলে বেরতেই বৃদ্ধর চোখ পড়ল আমার মুখের ওপর। নিষ্প্রভ ধূসর চোখ, কিনারার দিকে লালচে। আমাকে দেখামাত্র মুখখানা ঢেউখেলানো করোগেটেড টিনের মতো তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল মধুর আপ্যায়নের ভঙ্গিমায়।

যাক, এসে গেছেন। বাড়ির ঠিকানাটা একদম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। বলুন আছেন কেমন, মি. ইডেন!

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। চিনি না, শুনি না, কিন্তু এমন সাদর সম্ভাষণ করে বসল যেন সাত জন্মের চেনাশোনা। বগলের বুটজোড়ার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখে মেজাজটাও গেল খিঁচড়ে। সুতরাং পালটা ভদ্রতা অবশ্যই দেখাইনি।

বুড়ো তা লক্ষ করে বললে, ভাবছেন এ আবার কে? বন্ধু... বন্ধু বলেই মেনে নিন। কেমন? আমাকে আপনি দেখেননি ঠিকই, কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি। কোথায় কথা বলা যায় বলুন তো?

দ্বিধায় পড়লাম। আমার নিজের ঘরের যা ছিরি, কোনও অজানা-অচেনা মানুষকে সেখানে বসানো যায় না।

তাই বললাম, চলুন-না, হাঁটা যাক।

রাস্তায় তো? কোনদিকে বলুন?

টুপ করে বুটজোড়া নামিয়ে নিলাম ফুটপাতে।

বুড়ো বললে, এসেছি তো বাজে কথা বলতে। লাঞ্চ খেতে খেতে বলা যাবেখন। বুড়ো হয়েছি, গলার আওয়াজ তো ফাটা বাঁশির মতো, গাড়ি-ঘোড়ার যা আওয়াজ

বলে, আমার বাহু স্পর্শ করেছিল বুড়ো, যাতে অমত না করি। লক্ষ করলাম, হাত কাঁপছে বুড়োর পয়সায় খেতে মন চায়নি। ক্ষীণ আপত্তি করেছিলাম। বুড়ো শোনেনি। পাকা চুলকে একটু শ্রদ্ধা জানালে ক্ষতি কী? রাজি হয়ে গেলাম যুক্তি শুনে।

দুজনে গেলাম ব্ল্যাভিটস্কির হোটেলে। এমন খাসা খানা অনেকদিন খাইনি। খেতে খেতে যখন কাজের প্রশ্ন করলাম, সুকৌশলে এড়িয়ে গেল বুড়ো। চেহারাটা দেখে নিলাম বেশ খুঁটিয়ে। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। মুখ সরু। চামড়া কোঁচকানো। দাঁত বাঁধানো। শিথিল ঠোঁট ঝুলছে বাঁধাই দাঁতের ওপর। সাদা চুল খুবই পাতলা আর লম্বা। আমার যা বিরাট শরীর, বেশির ভাগ লোকই সে তুলনায় বামন বললেই চলে। সুতরাং বুড়োর ছোটখাটো আকৃতি দেখে খুব একটা মাথা ঘামালাম না। কাঁধ গোল। একটু কুঁজো।

লক্ষ করলাম, আমার ওপরেও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে বুড়ো। চাহনি যেন লোভাতুর। এরকম অদ্ভুত লোভ-চকচকে চোখ বড় একটা দেখা যায় না। আমার বৃষস্কন্ধ, আমার রোদে জ্বলা হাত, আমার ফুটফুটে দাগযুক্ত মুখ–সবই যেন লাভের উন্মেষ ঘটিয়ে চলেছে বৃদ্ধের চোখে।

খাওয়া শেষ হল, সিগারেট ধরিয়ে বুড়ো বললে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। প্রথমেই বলে রাখি, বয়স আমার খুবই বেশি–অথর্ব বলতে যা বোঝায়, তা-ই। কিন্তু আমার টাকা আছে। ছেলেপুলে নেই। ভাবনাটা সেই কারণেই, এত টাকা দিয়ে যাব কাকে?

এসব চালাকি আমার জানা আছে। পাঁচশো পাউন্ড না বেহাত হয়। সাবধান হয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। বুড়ো কিন্তু ইনিয়েবিনিয়ে গাওনা গেয়ে গেল নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের। বড় একা, বড় একা। উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না পেলে এত সম্পত্তি দেবে কাকে? নানা পরিকল্পনা এসেছিল মাথায়–কিন্তু খারিজ করেছে একটার পর একটা। দাঁতব্য প্রতিষ্ঠান,

স্কলারশিপ, সমাজসেবী সংস্থা, লাইব্রেরি–সব নাকচ হয়ে গেছে মনে মনে তৌল করার পর।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি, আমার মুখের ওপর খর-নজর নিবদ্ধ রেখে বলেছিল বৃদ্ধ, নওজোয়ান কাউকে দিয়ে যাব আমার বিপুল সম্পত্তি। এমন একজন যুবা পুরুষ চাই, যার উচ্চাকাক্ষা আছে, যার মন নির্ভেজাল, যে গরিব কিন্তু দেহ-মনে স্বাস্থ্যবান। হ্যাঁ, আবার বলছি, এইরকম একটি ছেলেকেই দিয়ে যাব আমার যা কিছু আছে–স-ব। ঝাটমুক্ত হব তখনই–কিন্তু আমার টাকায় সে উচ্চশিক্ষা পাবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করবে, স্বাধীন। জীবনযাপন করবে।

এমন ভান দেখানোর চেষ্টা করলাম যেন আমার কোনও আগ্রহই নেই। ছলনাটা নিতান্তই স্বচ্ছ যদিও। কাষ্ঠ হেসে বলেছিলাম, আমাকে দিয়ে সেইরকম একটা ছেলে খুঁজে বার করতে চান, এই তো?

ছলনা যে ধোপে টিকল না তা বুড়োর হাসি দেখেই বুঝলাম। সিগারেটে লম্বা টান মেরে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বললে, কয়েকটা শর্ত অবশ্য থাকবে। প্রথম, আমার নাম তাকে নিতে হবে। কিছু না দিলে কি কিছু পাওয়া যায়? দ্বিতীয়, সে যে যে পরিস্থিতিতে যে যে মহলে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, সবকিছুর মধ্যে আমাকেও রপ্ত করে দিতে হবে। বাজিয়ে নেব ভালো করেই। জানব তার বংশপরিচয়, জানব কীভাবে মারা গেছেন তার বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা। এমনকী তার চরিত্রের যেদিকটা পাঁচজনকে না জানিয়ে করা হয়–তা-ও জানব।

সেরকম ছেলে বলতে কি আমাকেই

হ্যাঁ, বাবা, তোমাকেই!

জবাব দিতে পারলাম না। মন-ময়ূর তখন পাখা মেলে ধরেছে। কল্পনার রথ তখন উড়ে চলেছে। বলবার মতো ভাষা এল না মুখে।

কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকার পর বলেছিলাম আমতা আমতা করে, কিন্তু দুনিয়ায় এত ছেলে থাকতে আমাকেই

প্রফেসার হ্যাসলারের কাছে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তোমার স্বাস্থ্য, চরিত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা–সবই নিরেট। নির্ভরযোগ্য। সততা আর স্বাস্থ্য যার মধ্যে আছে, আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে একমাত্র সে-ই। তুমিই সেই ছেলে।

বুড়োর সঙ্গে সেই আমার প্রথম মোলাকাত। প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম, রহস্যের আবরণে ঘিরে রেখে দিয়েছে নিজেকে। নাম বলেনি। দু-চারটে প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল বেশি নয়। বিদায় নিল ব্ল্যাভিটস্কির গাড়িবারান্দা থেকে। লাঞ্চের দাম মিটিয়ে দিয়েছিল পকেট থেকে এক মুঠো মোহর বার করে। কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার বলেছিল, দৈহিক স্বাস্থ্য অটুট থাকা চাই। চাহিদা বড়ই অদ্ভুত। খটকা লেগেছিল। তখনই। সেইদিনই বৃদ্ধের ইচ্ছেমতো মোটা টাকার জীবনবিমা করিয়েছিলাম। ডাক্তারদের চুলচেরা পরীক্ষা সত্ত্বেও খুশি হয়নি বুড়ো। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডক্টর হেন্ডারসনকে দিয়ে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বাজিয়ে নিয়েছিল। পরের সপ্তাহের শুক্রবারে নিয়েছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। ডাক শুনে নেমে এলাম নিচে। দেখলাম, বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে ম্যাড়মেড়ে গ্যাস-লণ্ঠনের তলায়। ছায়ামায়ায় বিদঘুটে হয়ে উঠেছে শীর্ণ মুখখানা। প্রথম দিন যতখানি কুঁজো দেখেছিলাম, সেদিন দেখলাম আরও বেশি। তোবড়ানো গাল তুবড়েছে আরও খানিকটা।

চাপা আবেগে কাঁপা গলায় বলেছিল, ইডেন, সবই তো মনের মতো হল–এবার তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। তার আগে একটু উৎসব করে নেওয়া যাক–আজ রাতেই –দেরি না–একদম না।...

বলতে বলতে কুঁজো দেহটা দুমড়ে গিয়েছিল কাশির ধমকে। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে, হাড় বার-করা আঙুলে আমার বাহু খামচে ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। ছ্যাকড়া গাড়ি থামিয়ে ভেতরে উঠে বসেছিল আমাকে নিয়ে, ঝড়ের মতো গাড়ি বেয়ে। গিয়েছিল রিজেন্ট স্ট্রিটের খানদানি রেস্তরাঁয়। সেদিনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দৃশ্য জ্বলজ্বল করছে মনের মধ্যে। গ্যাসের লণ্ঠন, তেলের বাতি, বিজলি আলো সাঁত সাঁত করে বেরিয়ে গিয়েছিল দুপাশ দিয়ে। জনবহুল পথেও গাড়ি উড়ে যাচ্ছিল যেন পক্ষিরাজের মতো।

দারুণ খানা খেয়েছিলাম রেস্তরাঁয়। আমার সাদামাটা পোশাকের দিকে সুবেশ ওয়েটারের তির্যক চাহনি প্রথমটা একটু দমিয়ে দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল পেটে শ্যাম্পেন পড়তেই। ফিরে এসেছিল আত্মবিশ্বাস।

নিজের কথা দিয়েই কথাবার্তা শুরু করেছিল বৃদ্ধ। গাড়িতে আসবার সময়ে বলেছিল নিজের নাম। স্কুলে পড়বার সময়েই শুনেছিলাম সেই নাম। বিরাট দার্শনিক। এগবার্ট এলভেসহ্যাম, ছেলেবেলা থেকেই যার বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পড়েছে আমার ওপর, যার জীবনদর্শন নাড়া দিয়ে গেছে আমাকে বিলক্ষণ, বিখ্যাত সেই ধীশক্তিটি কৃশকায় অপটু জীর্ণ দেহে আমার এত সান্নিধ্যে এসেছে জেনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম আমি। স্মরণীয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে হতাশ হয় অনেকেই–আমার হতাশা উপলব্ধি করতে পারবে তারাই। কথার তোড়ে অনেক কথাই বলে গিয়েছিল বৃদ্ধ। আয়ু তো প্রায় শেষ, প্রাণবহ্নি নিবু নিবু–কোনওরকমে টিকিয়ে-রাখা জীবনধারা ধু ধু মরু হয়ে যাবে সর্বস্ব আমাকে দান করার পর। বাড়ি, লেখার স্বত্ব, জমানো টাকা, নানা ব্যবসায়ে লগ্নি করা অর্থ-সমস্ত এবার থেকে হবে আমারই। দার্শনিকরা যে এত বড়লোক হয়, আগে জানা ছিল না। আমার খাওয়া এবং মদ্যপান–দুটোই ঈর্ষার চোখে নিরীক্ষণ করে গেছে বৃদ্ধ। বলেছিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাঁচবার সামর্থ্য আছে বটে তোমার–তবে বেশি দিন থাকে না কিছুই। দীর্ঘশ্বাসের ধরনটা আমার কাছে মনে হয়েছিল একটু অন্য রকমের। যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেল বৃদ্ধ।

শ্যাম্পেন খেয়ে আমার মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বলেছিলাম সোল্লাসে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তো আছে। উজ্জ্বলতর হবে সেই ভবিষ্যৎ আপনার কৃপায়। আপনার নাম ব্যবহারের সম্মান পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? আপনার গৌরবময় অতীতও হবে আমার ভবিষ্যতের পাথেয়।...।

তোষামুদে তারিফ শুনে একটু বিষণ্ণভাবেই মাথা নেড়ে ক্ষীণ হাসি হেসেছিল বুড়ো। বলেছিল, ভবিষ্যৎ কি পালটাতে পারবে? আমার নাম নিতে তোমার আপত্তি নেই, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিতেও দ্বিধা নেই, কিন্তু পারবে কি আমার বয়সের ভার মাথায় নিতে?

আপনার সমস্ত কীর্তির সঙ্গে সঙ্গে তা তো নেবই, বলেছিলাম বুক চিতিয়ে।

ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। হেসে সুপেয় সুরার অর্ডার দিয়েছিল বৃদ্ধ। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বার করে হলদেটে কাঁপা আঙুলে মোড়ক খুলতে খুলতে বলেছিল, এর মধ্যে আছে আমার অপ্রকাশিত জ্ঞানের একটুখানি। অডার দিলাম কুমেল-এর–এই জিনিস একটু ছিটিয়ে দাও তার মধ্যে–দেখবে কুমেল হয়ে গেছে হিমেল।

কুমেল একজাতীয় উৎকৃষ্ট আসব। যে জিনিসটা ছিটিয়ে দেওয়ার জন্যে মোড়ক খুলে দেখালে, সেটা একটা গোলাপি গুঁড়ো। শেষ কথাটা বলতে বলতে মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

সুরার সৌরভ নিয়েও এত বড় দার্শনিক মাথা ঘামায়, ভাবতে গিয়ে মনে মনে আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু মদের নেশা সত্ত্বেও বুড়োর সৌরভবাতিক নিয়ে তোষামোদ করতে ছাড়িনি।

গোলাপি গুঁড়ো দুভাগ করে দুটি মদিরাপাত্রে মিশিয়ে দিয়েছিল বৃদ্ধ। তারপরেই আচমকা এমন মর্যাদাগম্ভীর ভঙ্গিমায় সুরাপাত্র বাড়িয়ে তুলেছিল আমার দিকে যে, থতমত খেয়ে

অনুকরণ করেছিলাম আমিও। টুং করে ঠোকাঠুকি লেগেছিল দুই গেলাসে। উত্তরাধিকার বর্তাক অবিলম্বে, বলেই গেলাস তুলেছিল ঠোঁটের গোড়ায়।

না, না, দ্রুত স্বরে বাধা দিয়েছিলাম আমি।

থমকে গিয়েছিল বৃদ্ধ। সুরাপাত্র নেমে এসেছিল চিবুকের তলায়। দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল আমার ওপর।

আমি বলেছিলাম, কামনা জানাই দীর্ঘ জীবনের।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল বৃদ্ধ।

পরক্ষণেই অট্টহেসে বলেছিল, তা-ই হোক, কামনা জানাই দীর্ঘ জীবনের।

দুজনে দুজনের চোখে চোখে চেয়ে খালি করে দিয়েছিলাম গেলাস। চোঁ চোঁ করে চুমুক দেওয়ার সময়েও দেখেছিলাম, বুড়োর চোখ নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। গেলাস খালি হতেই অদ্ভুত তীব্র একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। বিচিত্র সেই অনুভূতির প্রথম পরশেই তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল মস্তিষ্কের মধ্যে। খুলির মধ্যে কোষগুলো যেন সত্যি সত্যিই লাফালাফি জুড়েছে মনে হয়েছিল। কানের মধ্যে শুনেছিলাম একটানা গুঞ্জনধ্বনি। সুরার স্বাদ পাইনি জিবে অথবা গলায়, সৌরভে মুখ-গলা ভরে গেলেও তার উপলব্ধি ঘটেনি-বুড়োর ধূসর অনিমেষ চাহনির তীব্রতা যেন পুড়িয়ে দিয়েছিল আমার সত্তা। এক চুমুকেই শেষ করেছিলাম পাত্র। কতটুকুই বা আর সময় লাগে তাতে? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যেন অনন্তকাল ধরে চুমুক দিয়েই

চলেছি। মাথার মধ্যে লন্ডভন্ড কাণ্ডও অব্যাহত রয়েছে অনন্তকাল ধরে। দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মগজের প্রতিটা কোষ যেন তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছে করোটির মধ্যে। চিন্তা-বুদ্ধি সবকিছুই ঘোলাটে– আবিলতা কাটছে না কিছুতেই। চৈতন্য লোপ পেলেও পাচ্ছে না–অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় আবছাভাবে শুধু মনে আছে যেন বিস্তর অর্ধবিস্মৃত ঘটনা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে অস্ফুট অবস্থাতেই।

সম্মোহনের ঘোর ভঙ্গ করল বৃদ্ধ নিজেই। আচম্বিতে পাঁজর-ভাঙা দমকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নামিয়ে রাখল গেলাস।

বললে, কেমন বুঝছ?

অপূর্ব! সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে না পেরেও বলেছিলাম মুহ্যমানের মতো।

মাথায় তখন চরকিপাক দিচ্ছে। বসে পড়েছিলাম ধপ করে। প্রলয়কাণ্ড চলছে ব্রেনের মধ্যে, এইটুকুই কেবল উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম হাড়ে হাড়ে। একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল অনুভূতি। ফাঁপা, বক্র, অবতল আয়নায়।

যেভাবে সবকিছুই খুদে খুদেভাবে দেখা যায়, মনে হয়েছিল, সেইরকমই দেখছি। সামনের দৃশ্য–কাছে থেকেও যেন দূরে সরে গেছে, ছোট হয়ে গেছে। বুড়োর হাবভাবেও পরিবর্তন এসেছে। ধড়ফড় করছে অত্যন্ত নার্ভাসভাবে। চেনে বাঁধা ঘড়ি টেনে বার করল হন্তদন্ত ভঙ্গিমায়। এক পলক দেখেই যেন ভুত দেখার মতো চমকে উঠল। এখুনি না বেরলেই নয়। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। আরেকজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভাড়াটে গাড়িতে উঠে বসার পর

নিজের কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, গুঁড়োটা তোমাকে না খাওয়ালেই হত। কাল তো মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। এক কাজ কর। এই গুড়োটা নাও। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে খেয়ে নিয়ো, কেমন? শুতে যাওয়ার আগে কিন্তু খেয়াল থাকে যেন।

বলে একটা সাদা প্যাকেট গছিয়ে দিল আমার হাতে। অনেকটা সিডলিজ পাউডারের মতো দেখতে, যা নাকি মৃদু জোলাপ হিসেবে খাওয়া হয়। বুড়োর বুলে-পড়া চোখের পাতা দেখে বুঝলাম, আমার মতোই অবস্থা হয়েছে নিজেরও। প্যাকেটটা হাতে গছিয়ে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক বলে চেঁচিয়ে উঠতেই হাত খামচে ধরে আমিও বিদায় জানিয়েছিলাম সোল্লাসে। গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে বুকপকেট হাতড়ে শেভিং স্টিকের মতো একটা ছোট চোঙা বার করে গুঁজে দিলে আমার হাতে। দেখ দিকি কাণ্ড। এক্কেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কাল তো আবার দেখা হবে–তখন খুলো–তার আগে নয়। কেমন?

ঘড়ঘড় শব্দে বেরিয়ে গেল গাড়ি। পুঁচকে চোঙাটা হাত পেতে নিয়েছিলাম আলগোছে–আর-একটু হলেই হাত ফসকে পড়ে যেত রাস্তায়। দারুণ ভারী। সিসের না প্ল্যাটিনামের? দুপাশে আর মাঝখানের জোড় বরাবর লাল গালা লাগানো।

সযত্নে বস্তুটা রাখলাম পকেটে। মাথার মধ্যে চাকা ঘুরছে তখনও। ওই অবস্থাতেই হাঁটতে শুরু করলাম রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে। রাস্তার লোক কী ভাবল কে জানে। চলেছি আপন মনে। অন্ধকার গলিখুঁজি পেরিয়ে এলাম পোর্ট স্ট্রিটে। হাঁটছি যেন আফিমের ঘোরে। কে জানে গোলাপি গুঁড়োটা সত্যিই আফিম কি না। হাঁটার সময়ে যা যা অনুভব করেছিলাম, এখনও তা সুস্পষ্ট মনে আছে। আফিম খাওয়ার অভিজ্ঞতা আগে তো

কখনও হয়নি। মনটা যেন দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অনুভূতিটা কী করে বোঝাই, ভেবে পাচ্ছি না। রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন যেন বলতে চাইল, ওয়াটারলু স্টেশনে এসে গেছি–ট্রেনে ওঠা দরকার। চোখ রগড়ে নিয়ে দেখলাম, আরে গেল যা, রিজেন্ট স্ট্রিটেই তো হাঁটছি। বোঝতে পারলাম কি? পাকা অভিনেতা যেন কটমট করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে–আমি যেন আর-এক মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম–কটমটে চাহনির সময়ে জোর করে যা ছিলাম, তা-ই হয়ে গেলাম। রিজেন্ট স্ট্রিটকে রিজেন্ট স্ট্রিট মনে হতেই মনের মধ্যে ভিড় করে এল সৃষ্টিছাড়া অনেক স্মৃতি, মনে মনে ভাবলাম, ত্রিশ বছর আগে এইখানেই ঝগড়া করেছিলাম ভাইয়ের সঙ্গে। হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। ফ্যালফ্যাল করে পাশের পথচারীরা চেয়ে ছিল আমার দিকে। ত্রিশ বছর আগে তো জন্মই হয়নি আমার ভাই-টাইও নেই কস্মিনকালে। গোলাপি গুঁড়োর মাহাত্ম কী অপরিসীম। ভাই যে একটা ছিল, এই চিন্তাটা কিন্তু জাঁকিয়ে বসল মাথার মধ্যে এর পরেও। পোর্টল্যান্ড রোড দিয়ে যাওয়ার সময়ে নতুন মোড় নিল পাগলামি। মনে পড়ল এমন অনেক দোকানের কথা, যা অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তা আগে যা ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম বর্তমান রাস্তার চেহারা। আবিল চিন্তাধারার পুরানো স্মৃতি ঠেলাটেলি করে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পট দিলে অন্যান্য অনেক স্মৃতিও। ঘাবড়ে গেলাম খুবই। ভূতুড়ে স্মৃতির আনাগোনায় আরও গুলিয়ে গেল মাথা। স্টিভেন্স-এর দোকানের সামনে পৌঁছাতেই খেয়াল হল, কী যেন একটা কাজ ছিল দোকানটায়, কিন্তু মনে করতে পারছি না কিছুতেই। সশব্দে একটা বাস বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে, আওয়াজটা মনে হল অবিকল চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আগামীকাল তিনটে ব্যাং পাঠানোর কথা ছিল স্টিভেন্স-এর। আশ্চর্য! এই সহজ ব্যাপারটা ভুলে মেরে দিয়েছিলাম!

একটার পর একটা স্মৃতিদৃশ্য ভৌতিক ছায়ার মতো মনের মধ্যে ঠেলে উঠেই হটিয়ে দিচ্ছে তার একটা অপচ্ছায়ার মতো স্মৃতিকে। স্মৃতি আর স্মৃতি! কোনওটাই আমার জীবনে কখনও ঘটেনি–অথচ তা আমারই স্মৃতি মনে হচ্ছে! হুটোপাটি করছে মনের মধ্যে।

চেনা রাস্তা ছেড়ে কখন যে অন্য পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, সে খেয়ালও ছিল না। মাথার মধ্যে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলায়। ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটে পৌঁছানোর পর বাড়ির নম্বর মনে পড়ল না। অনেক চেষ্টার পর ২১এ নম্বর মনে পড়ল বটে, কিন্তু বেশ মনে হল, আর কেউ যেন নম্বরটা বলেছে আমাকে আমার নিজের বাড়ির নম্বর আমারই মনে নেই –অন্যে মনে করিয়ে দিয়েছে। মাথা ঠান্ডা করার জন্যে ডিনার খাওয়ার ঘটনাগুলো মাথায় আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই বুড়োর মুখটা আনতে পারলাম না মনের মধ্যে। আবছা ছায়ার মতো একটা আকৃতি বারবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল স্মৃতির পরদায়। ঠিক যেন কাচের শার্সিতে প্রতিফলিত কারও মুখ দেখছি। বুড়োর মুখের বদলে দেখলাম। নিজের অদ্ভুত রকমের বাহ্য আকৃতি। টেবিলে বসে উজ্জ্বল চোখে রাঙা মুখে বকর বকর করে চলেছি বিষম উৎসাহে।

অসম্ভব! অন্য গুঁড়োটা এবার খাওয়া দরকার! আর তো পারা যাচ্ছে না, বলেছিলাম। নিজের মনেই।

হলঘরে ঢুকে দেশলাই আর মোমবাতি খুঁজলাম যেদিকে, সেদিকে দেশলাই আর মোমবাতি কখনও থাকে না। সিঁড়িতে উঠে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কোন

তলায় রয়েছে আমার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলাম। মাতাল হয়েছি নিঃসন্দেহে। নইলে হোঁচট খাব কেন?

ঘরে ঢুকেই অচেনা লাগল সবকিছুই। জোর করে বশে আনলাম মনকে। উদ্ভট চিন্তাভাবনা তাড়ালাম মন থেকে। চেনা-চেনা মনে হল ঘরখানা। ওই তো আয়না–কোণে সাঁটা কাগজ। ওই তো চেয়ার–মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে জামাকাপড়। তা সত্ত্বেও বেশ মনে হল, জোর করে চেনবার চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু আমি যেন সেই মুহূর্তে বসে রয়েছি রেলগাড়িতে। গাড়ি থামল একটা স্টেশনে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি একটা অচেনা প্ল্যাটফর্মের দিকে।

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি পেয়ে গেলাম নাকি হঠাৎ? নাঃ! কালকেই চিঠি লিখতে হবে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে।

খাটে বসে বুট খুললাম পা থেকে। বেশ বুঝছি, আমার এই বর্তমান অনুভূতি আঁকা রয়েছে আর-একটা অনুভূতির ওপর। সেই অনুভূতিটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আসতে চাইছে ওপরে। একই সঙ্গে দুজায়গায় থাকা তো যায় না! জামাকাপড় অর্ধেক খুললাম, অর্ধেক পরেই রইলাম। পাউডারটা গেলাসে ঢেলে দিতেই ভুসভুস করে বুদবুদ উঠল কিছুক্ষণ। দ্যুতিময় অম্বর রঙে রঙিন হয়ে উঠল জল। গলায় ঢেলে দিলাম তৎক্ষণাৎ। বিছানায় শোয়ার সময়ে বুঝলাম, মাথা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বালিশটা মাথার তলায় লাগাতে না লাগাতেই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ। স্বপ্ন দেখছিলাম। অদ্ভুত জানোয়ারদের স্বপ্ন। মন ভারাক্রান্ত। নামহীন আতঙ্কে বুক তোলপাড়। মুখ বিস্বাদ। হাত-পা অবশ। চামড়ায় অস্বস্তিকর শিহরন। শুয়ে

রইলাম বালিশে মাথা দিয়ে। অস্বস্তি আর আতঙ্কের ভাবটা কেটে গেলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। কিন্তু তা হল না। বেড়েই চলল রহস্যজনক অপার্থিব অনুভূতি। চারপাশের খাপছাড়া দৃশ্য প্রথমে ধরতে পারিনি। মৃদু আলো রয়েছে ঘরে–প্রায় অন্ধকার বললেই চলে। তাল তাল তমিস্রার জায়গায় রয়েছে আসবাবপত্রগুলো। চাদরের ওপর দিয়ে। চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম সেইদিকে।

মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কেউ ঘরে ঢুকেছে। মানিব্যাগ নিয়ে চম্পট দেওয়ার মতলব। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর বুঝলাম, আশঙ্কাটা মনের ভ্রান্তি। তা সত্ত্বেও খটকা গেল না মন থেকে। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটেছে। মুন্ডু তুলে তাকালাম ঘরের চারদিকে। যা দেখলাম তা কল্পনাতে আনতে পারলাম না। অন্ধকার কোথাও কম, কোথাও বেশি। দেখা যাচ্ছে পরদা, টেবিল, ফায়ারপ্লেস, বইয়ের তাক এবং আরও অনেক কিছু। তারপরেই দূরের অন্ধকারের মধ্যে অচেনা-অপরিচিত অনেক কিছুই দেখতে পেলাম। খাট ঘুরে গেল নাকি? বইয়ের তাক হতে পারে দূরের ওই জমাট অন্ধকার, কিন্তু তার পাশে যা দেখছি, সেটা তো আমার চেয়ার নয়। চেয়ারের চেয়ে অনেক বড়।

ছেলেমানুষি আতঙ্কে গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পা বাড়ালাম খাট থেকে নামব বলে। কিন্তু মাটিতে পা ঠেকা দূরের কথা, তোশকের কিনারা পর্যন্ত পা পৌঁছাল না। এগিয়ে গিয়ে বসলাম খাটের ধারে। খাটের পাশেই থাকা উচিত মোমবাতি, ভাঙা চেয়ারের ওপর দেশলাই। হাত বাড়ালাম। হাতে ঠেকল না কোনওটাই। প্রায়ান্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে হাত ঠেকল ভারীমতো একটা বস্তুতে। খসখস আওয়াজ হল হাত দিতেই। খামচে ধরে টান দিতেই বুঝলাম, খাটের মাথায় ঝুলছে পরদা।

ঘুমের জড়তা তখন কেটে গেছে। বেশ বুঝলাম, অজানা-অচেনা একটা ঘরে বসে আছি। ঘাবড়ে গেলাম। গত রাতের ঘটনাগুলো মনে করলাম। অবাক কাণ্ড! সুস্পষ্ট মনে করতে পারলাম। খাওয়া, হাত পেতে মোড়ক নেওয়া, নেশাখোরের মতো হাঁটাচলা, আধখ্যাঁচড়াভাবে জামাকাপড় খোলা, বালিশে মাথা দেওয়ার পর নিবিড় প্রশান্তি। বিশ্বাস করতে পারলাম না নিজেকেই। গতকালের ঘটনা না পরশু রাতের ঘটনা? চুলোয় যাক, এ ঘরটা তো আমার নয়—এলাম কী করে? আবছা আঁধার আরও পাতলা হয়ে আসছে, জানলা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, খড়খড়ি দিয়ে যেন ভোরের আলো ঢুকছে। ডিম্বাকৃতি কাচটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতেই বড় কাহিল মনে হল নিজেকে। টলছি। কাঁপা হাত সামনে বাড়িয়ে জানলার দিকে এগতে গিয়ে হাঁটু ছড়ে গেল একটা চেয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়ায়। কাঁচে হাত বোলালাম। বেশ বড় কাচ। হাতে ঠেকল বাহারি ঝুলন্ত দীপাধার—পেতলনির্মিত। খড়খড়ির দড়ি খুঁজলাম। পেলাম না। হাত ঠেকল ঝুমকোয়। টান মারতেই খট করে খড়খড়ি উঠে গেল ওপরে।

যে দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে, তা কখনও দেখিনি। আকাশ মেঘে ঢাকা। ভোরের আবছা আলো মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। রক্ত-রঙিন হয়ে উঠেছে মেঘস্তূপের কিনারা আকাশের প্রান্তে। নিচে অন্ধকার। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দুরের পাহাড়, মসিকৃষ্ণ মহীরুহ, আবছা বাড়ির সারি। জানলার তলায় কালো ঝোপ, ফিকে ধূসর পথ। স্বপ্ন দেখছি নাকি? এসব তো কস্মিনকালেও দেখিনি! প্রসাধন টেবিলে হাত বোলালাম। পালিশ-করা কাঠ। সাজানোয় ত্রুটি তো নেই-ই, বরং বাহুল্য আছে। ছোট ছোট কাট-গ্লাসের শিশি রয়েছে বিস্তর। রয়েছে একটা বুরুশ। আরও একটা অদ্ভুত বস্তু হাতে ঠেকল। ঘোড়ার খুরের মতো আকার। মসৃণ। খোঁচা দুটো বেশ শক্ত। জিনিসটা রয়েছে

একটা প্লেটের ওপর। দেশলাই পেলাম না। মোমবাতিও পেলাম না। আবার চোখ বোলালাম ঘরময়। খড়খড়ি খোলা থাকায় আলো আসছে বলে দেখতে পেলাম, চারদিকে ঝোলানো পরদা দিয়ে ঢাকা বিরাট একটা খাট, খাটের পায়ের দিকে ঝকঝকে সাদা মার্বেল পাথরের মতো বস্তু দিয়ে তৈরি ফায়ারপ্লেস।

প্রসাধন টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে ফের চোখ খুলে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন নয়। একেবারে বাস্তব। গত রাতের নেশার ঘোের বোধহয় কাটেনি। রাতারাতি সম্পত্তির দখল নিয়ে ফেলেছি–এই পাগলামিটাই নেশার ঘোরে অবাস্তবকে বাস্তবের মতো নিশ্চয় তুলে ধরেছে চোখের সামনে। নিজের ঘরদোর সব ভুলে মেরে বসে আছি। সবুর করলেই নিশ্চয় আবার মনে পড়বে। বৃদ্ধ এলভেসহ্যামের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার স্মৃতিটা তো কিন্তু বেশ জ্বলজ্বলে।

শ্যাম্পেনের স্বাদ, ওয়েটারের তাচ্ছিল্যপূর্ণ চাহনি, গোলাপি গুঁড়ো, কড়া মদ–বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। যেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা।

তারপরেই ঘটল একটা তুচ্ছ কিন্তু ভয়ংকর ঘটনা। এখনও ভাবতে গিয়ে গা কাঁপছে। স্বগতোক্তি করেছিলাম–বেশ জোরেই।

কী মুশকিল! এলাম কোন চুলোয়?... কণ্ঠস্বর কিন্তু আমার নয়!

না, সে কণ্ঠস্বর কখনওই আমার নয়! অত সরু গলা আমার নয়! উচ্চারণ জড়িত। মুখের হাড়ে স্বরের অনুরণন অন্য ধরনের। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এক হাত দিয়ে আরেক হাত বুলিয়েছিলাম। হাতে ঠেকেছিল শিথিল চামড়া–ভাঁজ-খাওয়া কোঁচকানো চামড়া, হাড়ের

ওপর সেঁটে থাকা চামড়া। স্বপ্ন! নিঃসন্দেহে স্বপ্ন দেখছি! গলা তাই বিকৃত, চামড়াও খসখসে মনে হচ্ছে। হাত বুলিয়েছিলাম মুখে, দাঁত নেই। আঙুল ঠেকেছিল শুকিয়ে-যাওয়া মাড়িতে। ঘিনঘিন করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ।

আয়নায় দেখা দরকার মুখখানা। টলতে টলতে গিয়েছিলাম ম্যান্টেলের দিকে। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে ভয়ানক কাশির ধমকে প্রাণ যায় আর কী। খামচে ধরেছিলাম ফ্লানেলের রাত্রিবাস। আমার গায়ে ফ্লানেলের রাত্রিবাস?

দেশলাই পাইনি। খুব শীত করছিল। নাক বুজে আসছিল। কাশতে কাশতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। টলতে টলতে খাটে উঠে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখছি! স্বপ্ন দেখছি! খাটে উঠতে উঠতে বলেছিলাম গোঙানির স্বরে। অথর্ব বৃদ্ধরাই কিন্তু এইভাবে এক কথা বারবার বলে। চাদর মুড়ি দিয়ে জোর করে চোখে ঘুম টেনে আনার চেষ্টা করেছিলাম। ঘুমালেই স্বপ্ন উধাও হবে। ভোরের আলোয় চিনতে পারব চেনা ঘরকে।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তা হয়নি। ঘুমাতে পারিনি। পরিবর্তনটা ধীরগতিতে কিন্তু বেশ দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়ে বসছিল মনের মধ্যে। অব্যাখ্যাত রহস্যজনক পন্থায় আমি রাতারাতি বুড়িয়ে গেছি। যৌবন হারিয়েছি–হ্যারিয়েছি শক্তি, সামর্থ্য, ভবিষ্যতের স্বপ্ন! প্রতারিত হয়েছি রাতারাতি ঠগবাজের হাতে সঁপে দিয়েছি আমার জীবন আর যৌবনের অমূল্য সম্পদ। অজান্তেই আবার শীর্ণ আঙুল বুলিয়েছিলাম কুঁচকে-যাওয়া মাড়িতে। ভ্রান্তি নয়। সত্যি, নিষ্ঠুর সত্যি।

স্পষ্টতর হয়েছিল ভোরের আলো। ঘুমের চেষ্টা বাতুলতা বুঝে উঠে বসেছিলাম। হিমশীতল উষালোকে স্পষ্ট দেখেছিলাম ঘরের সব জিনিস। পেল্লায় ঘর। ফার্নিচারও

বিস্তর। রুচিসম্মত। জীবনে এমন ঘরে ঘুমাইনি। এক কোণে নিচু তেপায়ার ওপর মোমবাতি আর দেশলাই দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেমে পড়েছিলাম খাট থেকে। ভোরের ঠান্ডায় শিরশির করে উঠেছিল সর্বাঙ্গ–অথচ তখন গরমকাল। মোমবাতি ধরে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম–

এলভেসহ্যামের মুখ!

এই আতঙ্কটাই আবছাভাবে জড়িয়ে রেখেছিল এতক্ষণ আমাকে।

এলভেসহ্যামের শীর্ণকায় চেহারা আগেও দেখেছি–তখন গায়ে ছিল ধাচূড়া। এখন দেখলাম অনাবৃত অবস্থায়। রাত্রিবাস খসে পড়ায় সরু গলা আর হাড় বার-করা বুক দেখে শিউরে উঠেছিলাম। তোবড়োনো গাল। লম্বা নোংরা সাদা চুল, ঘোলাটে চোখ। শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট কাঁপছে থিরথির করে। নিচের শিথিল ঠোঁটের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালচে মাড়ি। সমবয়সিরা উপলব্ধি করবেন আমার মানসিক অবস্থা। পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম স্বাধীনতা হারিয়ে সহসা বন্দি হয়েছি এক জরাকম্পিত বৃদ্ধের জীর্ণ খাঁচায়–আয়ু যার নিঃশেষিত।

মূল কাহিনি থেকে কিন্তু সরে আসছি। ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া আচমকা দেহ-পরিবর্তন নিয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল চিন্তা করার ক্ষমতা। জানি না কোন জাদুমন্ত্রবলে এক দেহ থেকে আরেক দেহে যাওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু অব্যাখ্যাতভাবে ঠিক তা-ই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে। এলভেসহ্যামের পৈশাচিক মৌলিকতার নগ্নরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের মধ্যে। আমি যেমন তার দেহে ঢুকে বসে

আছি, নিঃসন্দেহে এলভেসহ্যামও ঢুকে পড়েছে আমার দেহে–আমার ভবিষ্যৎ, আমার শক্তি এখন তারই দখলে। কিন্তু তা প্রমাণ করা যায় কী করে?

সম্ভাবনাটা এমনই অসম্ভব যে, যাচাই করার জন্যে আবার চিমটি কেটেছিলাম চামড়ায়, আঙুল বুলিয়েছিলাম মাড়িতে, আয়নায় দেখেছিলাম মুখখানা। ঘটনা কিন্তু ঘটনাই থেকেছে। এমন জীবন-মরীচিকাও কি সম্ভব? সত্যিই কি আমি হয়েছি এলভেসহ্যাম, আর এলভেসহ্যাম হয়েছে আমি? ইডেনকে স্বপ্ন দেখছি না তো? ইডেন বলে সত্যিই কেউ কখনও ছিল কি? বেশ তো, আমি যদি এলভেসহ্যামই হই, তাহলে মনে থাকা উচিত। গতকাল সকালে ছিলাম কোথায়, আছি কোন শহরে এবং কী কী ঘটেছিল স্বপ্ন শুরুর অগে। ধস্তাধস্তি করেছিলাম চিন্তার সঙ্গে। গত রাতে দুটো স্মৃতি হুড়োহুড়ি করেছিল মনের মধ্যে। এখন মন পরিষ্কার। আসল ইডেনের কোনও স্মৃতিকেই টেনেটুনে তুলে আনতে পারলাম না মনের পরদায়।

যত্তসব পাগলামি! ফাটা বাঁশির মতো সরু গলায় চিৎকার করে উঠে টলতে টলতে দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মুখ ধোয়ার বেসিনের সামনে, ঠান্ডা জলে ভিজিয়েছিলাম মাথার সাদা চুল। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে আবার ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। বৃথা চেষ্টা। নিঃসন্দেহে আমি ইডেনই ছিলাম–এলভেসহ্যাম নয়। ইডেন কিন্তু এখন বন্দি রয়েছে। এলভেসহ্যামের শরীরে।

অন্য বয়সের মানুষ হলে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতাম নিজেকে। মন্ত্রের কাছে জারিজুরি খাটে না, অতএব হাল ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করতাম। কিন্তু এ যুগটা যাচাই করে নেওয়ার যুগ। অলৌকিক বা দৈব ঘটনা এ যুগে পাত্তা পায় না। অতএব পুরো

ব্যাপারটাই নিশ্চয় মনোবিজ্ঞানের কারসাজি। ওষুধ খাইয়ে আর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে যা ঘটানো যায়, তার উলটোটা ঘটিয়ে দেওয়া যেতে পারে অন্য ওষুধ খাইয়ে আবার নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতে পারলে। স্মৃতিলোপের ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু স্মৃতিবিনিময়ের ঘটনা কেউ কখনও শোনেনি! হাসতে গিয়ে বুড়োটে কেশো হাসি বেরিয়ে এসেছিল গলা দিয়ে। বুড়ো এলভেসহ্যামও নিশ্চয় আমার দুরবস্থা কল্পনা করে হাসছে এই মুহূর্তে। ভাবতেই প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলাম দপ করে–অথচ এরকম রাগে অগ্নিশর্মা হওয়ার ধাত আমার নয়। জামাকাপড় পরতে গিয়ে মেঝে থেকে যা কুড়িয়ে পেলাম তা সান্ধ্য পোশাক। ওয়ার্ডরোব খুলে বার করলাম সেকেলে ট্রাউজারস আর ড্রেসিং গাউন। সাদা মাথায় বুড়োটে টুপি চাপিয়ে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এলাম চাতালে।

তখন বোধহয় পৌনে ছটা। বাড়ি নিস্তব্ধ। সব জানালাতেই খড়খড়ি বন্ধ। চাতালটা বেশ চওড়া। দামি কার্পেট পাতা প্রশস্ত সোপান নেমে গেছে নিচের তলার অন্ধকার হলঘরে। সামনেই খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে লেখবার টেবিল, ঘোরানো বুককেস, চেয়ারের পেছনদিক আর মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত তাক বোঝাই সারি সারি চমৎকার বাঁধানো কেতাব।

আমার পড়ার ঘর, বিড়বিড় করে বলে খোলা দরজার দিকে এগিয়েই থমকে গিয়েছিলাম কণ্ঠস্বর কানে বেজে ওঠায়। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে নকল দাঁতের পাটি মাড়িতে বসিয়ে অভ্যস্ত কায়দায় কামড় বসাতে খাপে খাপে বসে গিয়েছিল বাঁধাই দাঁত।

লেখবার টেবিলের সব ড্রয়ারেই চাবি দেওয়া। ওপরে খাড়াই ঘোরানো অংশটাতেও চাবি দেওয়া। চাবি কোথাও নেই–এমনকী আমার প্যান্টের পকেটেও নেই। শোবার ঘরে পা টেনে টেনে গিয়ে সব কটা জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়ালাম। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হল যেন চোর ঢুকেছিল। ঘরময় ছত্রাকার জামা-প্যান্টের কোনও পকেটেই নেই চাবি, নেই টাকাপয়সা, নেই একচিলতে কাগজ–গত রাত্রের ডিনার খাওয়ার বিলটা ছাড়া।

বসে পড়েছিলাম। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম প্রত্যেকটা টেনে বার করা জামা-প্যান্টের দিকে। প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি তখন নিবে গেছে। নিঃসীম নিরাশায় ভেঙে পড়েছি। প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করেছি শত্রুর বিপুল বুদ্ধিমত্তা, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি কতখানি অসহায় আমি। জোর করে উঠে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিলাম পড়ার ঘরে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খড়খড়ি টেনে তুলছিল একজন পরিচারিকা। আমার মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় চেয়ে রইল চোখ বড় বড় করে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুল্লি খোঁচানোর লোহার ডান্ডা মেরে ভাঙতে লাগলাম লেখবার টেবিল। চুরমার হয়ে গিয়েছিল টেবিলের ওপরদিক, খসে পড়েছিল তালা, খুপরি থেকে চিঠিপত্র ছিটকে পড়েছিল ঘরময়। রগচটা বৃদ্ধের মতোই কলম ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, দোয়াত উলটে দিয়েছিলাম, লেখবার হালকা সরঞ্জাম সমস্ত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। ম্যান্টেলের ওপর বিরাট ফুলদানিও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল –কীভাবে তা বলতে পারব না। তছনছ করেও পাইনি চেকবই, টাকা অথবা আমার দেহ ফিরিয়ে আনার কোনও নিদর্শন। ড্রয়ারগুলো পিটিয়ে তক্তা করার সময়ে দুজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে খাসভৃত্য ঘরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর।

সংক্ষেপে, এই আমার দেহ-পরিবর্তনের গল্প। ছিটগ্রস্তের এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি কি তা জানি না? পাগল হয়ে গেছি, তাই নাকি নজরবন্দি আমি। কিন্তু পাগল যে হইনি, তা প্রমাণ করার জন্যেই কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসেছি এই কাহিনি লিখব বলে। কিছু বাদ দিলাম না–খুঁটিয়ে লিখলাম। পাঠক-পাঠিকারা পড়ে বলুন, রচনাশৈলী বা বলার ভঙ্গির মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি? এক বৃদ্ধের দেহপিঞ্জরে বন্দি এক তরুণের হাহাকার নয় কি এই কাহিনি? এত বড় একটা সত্যি ঘটনাও কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় কারও কাছেই। আমার ডাক্তারের, আমার সেক্রেটারিদের, আমার চাকর-চাকরানি এবং প্রতিবেশীদের নাম জানি না। খুবই স্বাভাবিক। তারা আসছে রোজ, কিন্তু যেহেতু তাদের চিনতে পারছি না, তাই আমাকে অপ্রকৃতিস্থ ধরে নিচ্ছে। এদের চোখে তো আমি পাগলই–বদ্ধ পাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছি এদের প্রত্যেককে, কাঁদছি, গলাবাজি করছি, নিষ্ফল রাগে হাত-পা ছুড়ছি। আমার অবস্থায় এর প্রতিটি স্বাভাবিক–ওদের কাছে। অস্বাভাবিক। আমার কাছে টাকা নেই, চেকবইও নেই। ব্যাঙ্কে আমার সই মিলবে না–কাঁপা হাতে যে সই করব, তাতে তো মনে হয় ইডেনের লেখার টান থাকবেই। আমি যে নিজে ব্যাঙ্কে গিয়ে সব কথা বলব, সে পথও বন্ধ। এই শুভানুধ্যায়ীরা বেরতে দিচ্ছে না। আমার অ্যাকাউন্ট রয়েছে লন্ডনের কোনও এক পাড়ায়। ধড়িবাজ এলভেসহ্যাম নিশ্চয় নিজের আইনবিদের নামও গোপন রেখেছে বাড়ির লোকের কাছে–যাচাই করার সে পথও বন্ধ। এলভেসহ্যাম মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিল। আমার কাহিনি শুনে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, মন। নিয়ে বেশি তন্ময় থাকায় মাথা বিগড়েছে এলভেসহ্যামের, মানে আমার। নিজেকেই নাকি আর নিজে বলে চিনতে পারছি না। দুদিন আগে ছিলাম প্রাণবন্ত যুবক–সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর আজ আমি জরাজীর্ণ; ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে হনহন করে টহল দিচ্ছি বাড়িময়, রেগে টং হয়ে আছি, ভয়ে কেউ সামনে আসছে না–দূর থেকে নজরবন্দি রেখেছে উন্মাদকে। লন্ডনে এই মুহূর্তে পূর্ণ যৌবনের

সমস্ত সুযোগ নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চলেছে এলভেসহ্যাম–সেই সঙ্গে মগজের মধ্যে ঠাসা রয়েছে সত্তর বছরের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা। চুরি করেছে কেবল আমার জীবনটা! কীভাবে যে এ কাণ্ড ঘটল, আজও তা পরিষ্কার নয় আমার কাছে। পড়ার ঘর ভরতি অনেক পাণ্ডুলিপিতে দেখেছি মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সংক্ষেপে লিখে রেখেছে এলভেসহ্যাম, সাংকেতিক হরফে অনেক গণনাও রয়েছে– আমার কাছে সবই দুর্বোধ্য। কয়েক জায়গায় যা লিখেছে, তা পড়ে এইটুকু বুঝলাম যে, অঙ্কশাস্ত্রের দর্শনবাদ নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে বিস্তর। যে জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের জন্যে এলভেসহ্যামের আসল ব্যক্তিত্ব, জীর্ণ এই মগজ থেকে তার সবটুকুই চালান করেছে আমার তাজা মগজে এবং আমার যা কিছু তা বিদেয় করেছে এই বাতিল মগজের খাঁচায়। এককথায়, দেহবদল করেছে বুড়ো। এ জিনিস সম্ভব হয় কী করে, তা-ই তো ভেবে থই পাচ্ছি না। আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। চিন্তার জগতে আমি বরাবর বস্তুবাদী। হঠাৎ এই ঘটনার পর দেখছি বস্তু থেকে ব্যক্তির সত্তা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব।

মরিয়া হয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব ঠিক করেছি। মরবার আগে বসেছি সব কথা লিখে রাখার জন্যে। আজ সকালে প্রাতরাশের টেবিল থেকে একটা ছুরি দিয়ে অভিশপ্ত এই টেবিলের একটা গুপ্ত ড্রয়ার ভেঙে ফেলেছি। গুপ্ত ড্রয়ার নামেই–চোখের সামনে রেখে যেন। গুপ্ত করা হয়েছে। ভেতরে পেয়েছি একটা ছোট্ট সবুজ শিশি–আর কিছু না। শিশির মধ্যে রয়েছে খানিকটা সাদা গুঁড়ো। লেবেলে লেখা একটাই শব্দ–মুক্তি। নিঃসন্দেহে বিষ। এলভেসহ্যামই রেখেছে আমার নাগালের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অছিলায়–যাতে খেয়ে মরি এবং তার অপকর্মের একমাত্র সাক্ষীটি ইহলোক থেকে বিদায় নেয়। লোকটা যত দুরাত্মাই হোক, অমর হওয়ার পথ যে আবিষ্কার করেছে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। দুর্ঘটনা না ঘটলে, আমার শরীর নিয়ে বাঁচবে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। তারপর সুযোগ বুঝে

জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে প্রবেশ করবে আবার কোনও হতভাগ্য তরুণের দেহে। চুরি করবে তার জীবন, যৌবন, ভবিষ্যৎ। হৃদয়হীন সন্দেহ নেই... কিন্তু আমি ভাবছি, এইভাবে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকবে কোথায়... ভাবছি, কতকাল ধরে এইভাবে দেহ থেকে দেহান্তরে লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে বৃদ্ধ... কিন্তু আর পারছি না। ক্লান্তি বোধ করছি। সাদা গুড়ো জলে গুলে যায় দেখেছি। খেতেও খারাপ নয়।

.

মি. এলভেসহ্যামের টেবিলে পড়ে-থাকা লেখাটার শেষ এইখানেই। মৃতদেহটা পড়ে ছিল চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে। শেষ মুহূর্তে খিচুনির সময়ে সম্ভবত চেয়ার ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল পেছনে। গল্পটা পেনসিলে লেখা, হাতের লেখাও মি. এলভেসহ্যামের সুন্দর হস্তাক্ষরের মতো নয়। দুটো অদ্ভুত ঘটনা নথিভুক্ত করেই ইতি টানা যাক উপাখ্যানে। ইডেন আর এলভেসহ্যামের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশই নেই। কেননা এলভেসহ্যামের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হয়েছে ইডেনকে। ইডেন কিন্তু উত্তরাধিকারী হয়েও হতে পারেনি। মারা গিয়েছিল এলভেসহ্যাম আত্মহত্যা করার চব্বিশ ঘণ্টা আগে–জনবহুল চৌমাথায় গাড়িচাপা পড়ে। অত্যাশ্চর্য এই কাহিনিতে আলোকসম্পাত করতে পারত একমাত্র যে ব্যক্তি, এখন সে জেরার বাইরে।